



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 164 - 173

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাসুদেব দাশগুপ্তের 'খেলাধুলা' : টাইপরাইটার বিপ্লব অথবা খরার গল্প

ড. ভাস্কর খাঁড়া

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

বাগনান কলেজ, হাওড়া

Email ID: bhaskar.khanra@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Basudeb Dasgupta,
Political Novel,
Marxism, Naxal,
Hungry
Generation, Left-
front Govt of West
Bengal, Declining
of Political Values,
Innovative
narrative style.

Abstract

Basudeb Dasgupta's *Kheladhula* (1981) occupies a unique position in modern Bengali fiction. Published in the little magazine *Dandashuk* and extending over only 102 pages, it remains the author's first and only novel. Though Dasgupta's literary output was relatively small - around thirty short stories and a single novel - his contribution to Bengali literature is significant because of his experimental narrative techniques and his association with the Hungry Generation movement. His writings represent an alternative literary stream that challenges conventional reading habits and narrative expectations.

The novel departs from the traditional structure of Bengali fiction. It does not follow a linear plot with a clear beginning, middle, and end, nor does it employ a conventional pattern of narrative progression and resolution. Instead, the text opens in the form of a letter addressed to a friend, Anjan, whose encouragement reportedly inspired the writing of the novel. This epistolary beginning establishes a playful and self-reflexive mode of narration. The story revolves around a central character, Paritosh, around whom numerous minor characters appear and disappear. These characters do not emerge as fully developed individuals; rather, they enter the narrative briefly, perform a specific function, and exit. Their fragmented appearances, however, contribute significantly to the novel's thematic depth and social realism. Characters such as Bhadurimashai, Shanti, Nibaran Babu, Kamal, the elder brother-in-law, fellow passengers, and participants in local gatherings collectively construct a complex social landscape through their interactions with Paritosh.

A major feature of Dasgupta's writing is his innovative narrative style. Critics have sometimes compared his method to William Burroughs' 'cut-up' technique, although Dasgupta himself claimed to have developed this approach independently. He described it as a process of moving effortlessly from one event to another, from one place to another, and from one speaker to

another. The resulting narrative resembles cinematic montage, where apparently disconnected scenes and voices are juxtaposed to create deeper patterns of meaning. Through this collage-like structure, the novel captures the contradictions and dialectical processes of social reality. Dasgupta believed that such a method was particularly effective for representing the complex interactions between society and individual experience. Influenced by cinema and screenplay techniques, he emphasized the importance of observation, listening, and selective arrangement in constructing literary narratives. Thus, *Kheladhula* stands as an important experiment in Bengali fiction, demonstrating how fragmented narration and cinematic composition can reveal profound social and psychological truths beyond the limits of conventional storytelling.

Discussion

[১]

১৯৮১ সালে ‘দন্দশূক’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১০২ পাতার একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস ‘খেলাধূলা’। প্রায় বিয়াল্লিশ বছর বয়সী এক লেখকের প্রথম উপন্যাস। একমাত্রও বটে। লেখকের নাম বাসুদেব দাশগুপ্ত। হাংরি আন্দোলনের একজন শক্তিশালী গদ্যকার হিসাবে যিনি এখন কিছুটা হলেও পরিচিত স্বল্প এক পাঠকবৃত্তে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘রন্ধনশালা’। মাত্র চারটি ছোটগল্প নিয়ে প্রকাশিত সেই গল্পগ্রন্থের মধ্যেই ধরা গিয়েছিল বাসুদেব দাশগুপ্তের অনন্যতা। ৬৮ বছরের জীবনপর্বে দিস্তা দিস্তা লেখা যিনি পাঠককে উপহার দিয়ে যেতে পারেননি। মোটামুটি তিরিশটির মতো গল্প [২০১৪ সালে প্রকাশিত তাঁর রচনা সংগ্রহে^১ পাওয়া যাচ্ছে মোট ২৯টি গল্প] এবং ওই একটি মাত্র উপন্যাস বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর অবদান। তবে সংখ্যার প্রাচুর্য দিয়ে যে সাহিত্যের মূল্যায়ন নির্ধারিত হয় না সেই সত্য বাসুদেব প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর গল্প ও উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ প্রতিশ্রোতের পরিচয় বহন করছে – যে শ্রোতে সবাই সাঁতার দিতে পারে না।

[২]

‘খেলাধূলা’ উপন্যাসের গঠনশৈলী আর পাঁচটা উপন্যাসের চেয়ে পৃথক। আমাদের পঠন-অভ্যাসের অনুগামী কোনও আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত কাহিনি কিংবা আরোহ-উত্তুঙ্গ-অবরোহ রেখা অবলম্বিত কোনও প্লট বিন্যাস এই উপন্যাসে পাওয়া যায় না। উপন্যাসের সূচনাভঙ্গিটিও বন্ধু অঞ্জনকে চিঠি লেখার মতো করে। পাঠক স্মরণে রাখবেন, চন্দননগর থেকে প্রকাশিত অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘দন্দশূক’ পত্রিকাতেই প্রথম এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। অঞ্জনের তাগাদাতেই বাস্তবে এই উপন্যাস রচিত হয়। যেন সেই ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিয়ে খেলার ছলেই একটা রচনা এগিয়ে যেতে থাকে। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় চরিত্র পরিতোষ। তার চারপাশে অনেক রকম চরিত্র ঘোরাফেরা করে। আর এই সব চলমান চরিত্রগুলি তাদের সমগ্রতা নিয়ে উপন্যাসে হাজির নয়। কিছুক্ষণের জন্য উপন্যাসে তাদের আগমন। নিজস্ব কার্য সিদ্ধ করে তাদের নির্গম। খন্ড খন্ড তাদের উপস্থিতি সবটাই পরিতোষকে কেন্দ্র করে। পরিতোষের সঙ্গে তাদের কথাবার্তা, মত-বিনিময়, তর্ক-বিতর্ক – উপন্যাসে এইটুকুই তাদের অবদান। গড়ে ওঠার আগেই হারিয়ে যায় তারা। শুধু রেখে যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু বাস্তবতা। তাই প্রচুর খন্ড খন্ড চরিত্র এই উপন্যাসে থাকলেও গুরুত্বের দিক থেকে প্রত্যেকটি চরিত্রই নিজস্ব ভূমিতে অটল। মাত্র একটা দৃশ্যে আবির্ভূত হয়েও তাই ভাদুড়ীমশাই, শান্তি, নিবারণবাবু, কমল, বড় শালা, ভ্যান রিকশার সহযাত্রী বা তাড়ির আড্ডার লোকজন প্রত্যেকেই এই উপন্যাসের সিদ্ধিতে অনিবার্য ভূমিকা পালন করেছে।

বাসুদেব দাশগুপ্ত প্রথম থেকেই বর্ণনাভঙ্গিতে অনন্য। তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ ‘রন্ধনশালা’ থেকেই তার প্রমাণ মিলেছে। ‘দেবতাদের কয়েকমিনিট’ লিখছেন যখন তখনও ব্যবহার করছেন বর্ণনার বিশেষ পদ্ধতি। কেউ কেউ তার সেই কথনভঙ্গিকে উইলিয়াম বারোজ^২ দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু বাসুদেব জানিয়েছেন বারোজ পড়ার আগেই তিনি এই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। এই বিশেষ ফর্মের ব্যাপারে তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, -

“আসলে একটা ঘটনা থেকে আর একটা ঘটনায়, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়, একজনের কথা থেকে আরেক জনের কথায় অতি সহজে চলে যাবার একবিশেষ প্রক্রিয়া আমি আবিষ্কার করেছিলাম মাত্র...”^৭

তাঁর রচনার এই সিনেমাতিক ভঙ্গি কাট আপ্ পদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয়। কলম নয়, যেন ক্যামেরা হাতে তুলে পাঠককে বিভিন্ন স্থান, কালের কোলাজ তৈরি করে দিচ্ছেন তিনি। গড়ে উঠছে আপাত বিচ্ছিন্ন কিন্তু গভীরে সাযুজ্যময় এক বয়ান। যদিও যত্রতত্র এই ধরনের পরিভাষা প্রয়োগের পক্ষপাতী বাসুদেব নন, তবে এই সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন, -

“আমার মনে হয় সমাজের যাবতীয় জটিল ক্রিয়া প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্বিক নিয়মকে এক ব্যক্তির জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চাইলে কাট আপ্ বা কোলাজ পদ্ধতি বেশ সাহায্য করে। অবশ্য এই পদ্ধতি সম্পর্কে আমি প্রথম সচেতন হয়ে উঠি সিনেমা দেখে আর সিনেমার চিত্রনাট্য পড়ে। ... লেখায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে সবচেয়ে আগে তৈরি করা দরকার দেখার চোখ, শোনার কান আর নির্বাচনের ক্ষমতা।”^৮

[৩]

চোখে দেখা, কানে শোনা আর নির্বাচন করা - এই তিন সূত্রকে কাজে লাগিয়েই তিনি নির্মাণ করেছেন তার রাজনৈতিক উপন্যাস। শুরু থেকেই তিনি সচেতন। চিরাচরিত আবেগ-নির্ভর রাজনৈতিক রচনা যেন না হয়ে ওঠে ‘খেলাধূলা’। তিনি প্রাধান্য দিচ্ছেন চিন্তাকে।^৯ নকশাল আন্দোলন পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গ এই উপন্যাসের পটভূমি। বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার চার বছরের মাথায় এই উপন্যাসের কাহিনি শুরু। উপন্যাসের শুরুতেই বাসুদেব এই কালপর্ব স্পষ্ট করে দিয়েছেন। “শেষ পর্যন্ত ১৯৮০ সালের এপ্রিল মাস থেকেই শুরু করার কথা ভাবছি। ... শেষ করব অক্টোবরে, পুজোর পরে।”^{১০} অর্থাৎ লেখকেরই হিসাব মতো ছয়-সাত মাসের এক সময়পর্ব এই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। তবে, শুধু এই ছয়-সাত মাস নয়, প্রসঙ্গক্রমে এই উপন্যাসে ঘুরে-ফিরে এসেছে আরও তিন-চার বছর পূর্বের সময়কাল। দীর্ঘ কয়েক বছরের রক্তক্ষয়ী নকশাল আন্দোলন তখন স্তিমিত। ১৯৭৭ সালে সংসদীয় রাজনীতির নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করেছে সিপিএম-চালিত বামফ্রন্ট সরকার।

তবে ‘খেলাধূলা’ উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিত তথা পশ্চিমবঙ্গে বাম-রাজনীতির পরিণতিকে বুঝতে গেলে স্বাধীনতা-পরবর্তী বিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির মূল দ্বন্দ্বের ইতিহাসটিকেও বোঝা দরকার। ১৯৬৪ সালে অখন্ড কমিউনিস্ট পার্টি [সিপিআই] ভেঙে তৈরি হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) [সিপিআইএম]। মনে রাখা জরুরি, ভাগ হওয়ার সময় থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরে পার্টি লাইন নিয়ে বিরোধ শুরু হয়। সংশোধনবাদী হিসাবে চিহ্নিত একটি গোষ্ঠী সংসদীয় ভোট রাজনীতির মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পার্টি লাইন চিহ্নিত করে। অন্যদিকে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে দলের ভিতরেই সংশোধনবাদ বিরোধী তাত্ত্বিক লড়াই চলতে থাকে। এটি বিপ্লবী লাইন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এই বিপ্লবী অংশ মূলত কৃষক-বিদ্রোহ জাগরণের মধ্য দিয়ে, সশস্ত্র কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। ২৮ জানুয়ারি ১৯৬৫ থেকে এপ্রিল ১৯৬৭ সালের মধ্যে চারু মজুমদার রচনা করলেন ‘ঐতিহাসিক আর্টিকল দলিল’।^{১১} ইতিমধ্যে ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসের সাধারণ নির্বাচনে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অংশ নেয় ও কংগ্রেসের একাধিপত্যে ভাঙন ধরে। অজয় মুখার্জির মুখ্যমন্ত্রীত্বে পশ্চিমবঙ্গে গড়ে ওঠে প্রথম অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার। হরেকৃষ্ণ কোণ্ডার, জ্যোতি বসু, বিশ্বনাথ মুখার্জি প্রমুখ মার্কসবাদী নেতা সেই যুক্তফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রীও হলেন। এই সরকার গঠনের অব্যবহিত পরেই ১৯৬৭ সালের মে মাসে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী গোষ্ঠী চারু মজুমদার, কানু সান্যাল প্রমুখের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গের তরাই অঞ্চলে শুরু করেন - নকশালবাড়ি আন্দোলন। নকশাল আন্দোলনের উত্থান ও বিস্তৃতির ফলে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ভিতরের দ্বন্দ্ব তীব্র হয়ে ওঠে। একদিকে এই পার্টি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অংশ, আবার অন্যদিকে এই পার্টির নেতৃত্বেই সশস্ত্র কৃষক আন্দোলন সংঘটিত হচ্ছে। ২৫শে মে এই সরকারের পুলিশের গুলিতেই ১১ জন নিহত হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি মধ্যপন্থার নীতি গ্রহণ করে। একদিকে তার নকশালবাড়িতে পুলিশি হামলার নিন্দা করে, অন্য দিকে পার্টির বিপ্লবী গোষ্ঠীর সঙ্গে আদর্শগত সংগ্রামের সিদ্ধান্ত নেয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে সংশোধনবাদীদের

সংখ্যাধিক্যের কারণে সংসদীয় পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার নীতি গৃহীত হয় এবং অচিরেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নকশালবাড়ির ক্ষমতাদখলের স্লোগানকে অগ্রাহ্য করে সমস্ত আন্দোলনকে চিহ্নিত করে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াই হিসাবে। পার্টির বিচারে নকশালবাড়ি ‘হঠকারী লাইন’ এবং তা পরিত্যাগ করতে বিপ্লবী নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়। পার্টির বিপ্লবী গোষ্ঠী এই সিদ্ধান্ত মেনে না নিয়ে দলের মধ্যে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিলেন। চারু মজুমদার লিখলেন, -

“ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় কমিটি একটি রাজনৈতিক পন্থা গ্রহণ করেছেন যা মূলত বিপ্লব বিরোধী। চেয়ারম্যান মাও তুঙ্গের চিন্তা এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিরোধী। ... স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটি কোনও বিপ্লবী কমিটি নয়। তাই প্রতি মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদীর বিপ্লবী কর্তব্য হল এই কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করা।”^৮

কমিউনিস্ট পার্টি থেকে চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত-সহ বহু বিপ্লবী নেতা বহিস্কৃত হন। এই বিপ্লবী নেতারা সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা ‘দেশব্রতী’ এবং মাসিক ইংরাজি পত্রিকা ‘লিবারেশন প্রকাশ শুরু করেন। উদ্দেশ্য ছিল সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সংঘাতের তীব্রতায় নতুন পার্টি গঠন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল কমরেড লেনিনের জন্মদিনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) [সিপিআইএমএল] গঠিত হল। এর পরের কয়েকটি বছর নিরন্তর রক্তপাতের বছর। নকশালপন্থীদের মুক্তাঞ্চল গঠনের সংগ্রাম, শ্রেণিশত্রু খতমের অভিযান, নকশালপন্থীদের উপর পুলিশি প্রতিহিংসা, জরুরি অবস্থা জারি বাংলার রাজনীতিকে অস্থির করে তুলেছিল। ১৯৭৭ সালে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিপুল সংখ্যক বিধানসভা আসনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করে। নির্বাচনে জয়লাভ ও সরকার গঠনের ফলে সংশোধনবাদী, মধ্যপন্থী মতাদর্শেরই জয়লাভ যেন প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী শাখাটির নেতৃবৃন্দের অনেকেই (চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, সরোজ দত্ত) ততদিনে পুলিশি সম্মুখীন হন।

বিপ্লবীরা স্তব্ধ হলেন। সংশোধনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সিপিআইএম ক্ষমতায় এলো। তারপর? পরিবর্তন কি হল খেটে-খাওয়া মেহনতি মানুষের অবস্থার? কমিউনিস্ট সরকার কি উদ্যোগী হল জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিস্তারে? কমিউনিস্ট শাসনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিপ্লব-সাধন সম্ভব হল কি? সম্ভব হল কৃষি বিপ্লবের উপযোগী পরিবেশ? বন্ধ হল কি পুঁজিবাদের প্রসার আর দুর্নীতি? মার্কসবাদী আদর্শের রূপায়ণ ঘটলো সরকারি ব্যবস্থাপনায়? ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি শ্রমিক স্বার্থে কাজ করল? মনে রাখা জরুরি, এই বামফ্রন্ট সরকার পরবর্তী ৩৪ বছর পশ্চিমবঙ্গের একছত্র ক্ষমতা ভোগ করবে। যে সময়কাল সম্পর্কে নবাবুণ ভট্টাচার্য ১৯৯৩ সালে ‘হারবার্ট’ উপন্যাসে মন্তব্য করবেন, -

“এই ঘটনার পরে পচা, বন্ধ, অকিঞ্চিৎকর যে কালপর্ব চলেছে তা এতোই ক্লান্তিকর যে এর তুলনা অন্তত ইতিহাসে মেলা ভার।”^৯

[৪]

‘খেলাধূলা’ বস্তুত এই ‘পচা, বন্ধ, অকিঞ্চিৎকর’ সময়পর্ব শুরুর ইতিহাস। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনার পচন লক্ষণগুলি বাসুদেব দাশগুপ্ত ধরিয়ে দিয়েছে নবাবুণ ভট্টাচার্যের বহু আগে। তাঁর এই পর্যবেক্ষণ শক্তি ও তাকে নির্বাচন করে রচনায় তুলে আনার অনন্য ক্ষমতার নিদর্শন এই উপন্যাস। বস্তুত তাঁর গভীর রাজনৈতিক মণীষা, মার্কসবাদ ও মাওবাদ সম্পর্কে তার বিস্তৃত পড়াশোনা ও জীবনবাস্তবতার মধ্যে সেই পঠিত জ্ঞানের অনুসন্ধানের ফসল এই উপন্যাস। লেখার মধ্য দিয়ে শুধু শোষণের স্বরূপ বিশ্লেষণই তাঁর উদ্দেশ্য নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, -

“সেই সঙ্গে পাঠককে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাও আমার কর্তব্য, যাতে সে তার চারপাশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে একে পাল্টাবার জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। ... চারপাশে যা সব চলছে তাতে হয় আপনাকে ঠান্ডা মাথায় আত্মহত্যা করতে হবে নতুবা সমাজ পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।”^{১০}

‘খেলাধূলা’ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র পরিতোষ। সে এই কাহিনির কথকও বটে। তার দৃষ্টিভঙ্গির আলোতেই এই যুগ-পরিবেশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। কে এই পরিতোষ? কী তার রাজনৈতিক বিশ্বাস? মার্কসবাদের আদর্শে বিশ্বাসী একজন

রাজনীতি সচেতন স্কুলশিক্ষক পরিতোষ। কলকাতা শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরের এক উদ্বাস্তু কলোনিতে (অশোকনগর) তার বসবাস। নিজের এলাকায় বর্তমানে ছোট্ট একটি গণসঙ্গীতের স্কোয়াড করে গান গেয়ে বেড়ায়। গাঁটের পয়সা খরচ করে কাগজ বের করে। [কলকাতার লেখকদের অনুকরণে সাহিত্য পত্রিকা নয়]। উদ্দেশ্য রাজনৈতিকভাবে মানুষকে সচেতন করা, মার্কসবাদে দীক্ষিত করা। ‘প্রগ্রেসিভ স্টাডি সেন্টারও সে তৈরি করেছে চায়ের দোকানে গুলতানি মারা যুবকদের নিয়ে।

কী চায় পরিতোষ? সে চায় সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ। যে ব্যবস্থা, যে সিস্টেম চালু আছে তার মূল্যায়ন। মার্কসবাদে আস্থা বলেই সে সিপিআই, সিপিআইএম কিংবা সিপিআইএমএল – কোনও দলেরই অন্ধ সমর্থক নয়। মার্কসবাদের আদর্শ ও পার্টি লাইন যে এক নয় সেই বোধ তার ক্রমশ দৃঢ় হচ্ছে বাস্তব অভিজ্ঞতায়। আর যত দৃঢ় হচ্ছে সে অনুভব করছে মার্কসবাদের মূল দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ থেকে সব বামপন্থী দলই দূরে সরে আসছে। সমাজ পরিবর্তন বা বিপ্লব তো দূরের কথা সামান্য অন্তর্মূল্যায়ন, আত্মসমালোচনা করতেও কোনও দল রাজি নয়। তাই সব দলের পার্টি কর্মীদের সঙ্গেই তার মতান্তর এবং মনান্তর ঘটে চলে। সিপিআই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছেড়ে রাশিয়া নিয়ে বেশি ব্যস্ত। আর সিপিএমএল পার্টি নিজেদের অন্তর্কলহে ক্রমশই আরও টুকরো টুকরো হয়ে উঠছে। আর সরকার গঠন পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট ফ্রন্টের প্রধান ক্ষমতাসীন দলটির আচরণে পরিতোষ সর্বত্র প্রত্যক্ষ করে রাজনৈতিক অবক্ষয়। মার্কসবাদের শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ ক্রমশ চলে যেতে দেখে পার্টি লাইনের পিছনের সারিতে। নির্বাচন এবং নির্বাচনে জেতা ই যেন হয়ে ওঠে একটি বামপন্থী দলের মূল লক্ষ্য। পরিতোষ ভাবে সরকার গঠনের মাত্র চার বছরের মধ্যেই একটি সরকারের কাজকর্মকে ভ্রষ্ট অভিধায় চিহ্নিত করা হয়তো ঠিক নয়, তবু সর্বত্র যেসব লক্ষণ ফুটে উঠতে দেখে সে, আশান্বিত হওয়ার কোনও কারণই সে খুঁজে পায় না। বামপন্থী, অতি-বামপন্থী - কোনও দলের বাস্তব আচরণের মধ্যেই সে খুঁজে পায় না জনগণকে রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে তাদের প্রকৃত বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করে তোলার আদর্শ।

[৫]

পরিতোষের চোখ দিয়েই ধরা পড়ে নকশাল-আন্দোলন পরবর্তী বামপন্থী রাজনীতির শোচনীয় পরিণাম। প্রত্যাশা ছিল একটি প্রকৃত বামপন্থী সরকার তার জনগণকে যথার্থ অর্থে রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলে সামাজিক অসাম্য মোচনে জোর দেবে। কিন্তু সেই সবকিছুই হয় না। ভোট রাজনীতির ফসল ঘরে তোলার জন্য রিলিফের ও পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি জনগণকে স্বার্থাশ্রেষ্টী নেতার ক্রীতদাসে পরিণত করে ফেলে শেষ পর্যন্ত। বুর্জোয়া গণতন্ত্র জাঁকিয়ে বসে সর্বত্র। ফলস্বরূপ সরকারী যে-কোনও নীতি হয়ে ওঠে আর্থিক দুর্নীতির আখড়া। পরিতোষের উচ্চ-মধ্যবিত্ত বন্ধু প্রমথ যখন ব্যঙ্গ করে বলে ওঠে, -

“ক্লাস টেন পর্যন্ত ফ্রি, বেকার-ভাতা, পঞ্চগয়েত ভাতা, পে-কমিশন ... আর দেখতে হবে না, এর ঠালাতেই আপনাদের বিপ্লবের পোঁদে একটি বংশ দণ্ড চলে গেল।”^{২২}

পরিতোষ নিঃস্ব জনতার প্রয়োজনে রিলিফের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে প্রতিবাদ জানায় বটে, কিন্তু বাস্তব চিত্রটা প্রমথের পরবর্তী সংলাপে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে, -

“এটাকে আপনি রিলিফ বলছেন? টাকাগুলো পাচ্ছে কারা? গাড়ি করে বেকার-ভাতা আনতে যাচ্ছে, - তা-ও দেখছি। যারা বিপ্লব করবে তারা ধুকছে। আর আমরা মধ্যবিত্তেরা ভাতা-বিপ্লবের আনন্দে বগল বাজাচ্ছি।”^{২৩}

মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে হাতে রাখার জন্য এই রিলিফ-রাজনীতি যে আসলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক দেউলিয়াপনারই পরিচায়ক তা যেন মনে নিয়েই চুপ থাকতে হয় পরিতোষকে।

পরিতোষ নিজে স্কুল শিক্ষক। আমাদের দেশে বামপন্থী আন্দোলনে শিক্ষক সম্প্রদায় অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসাবে কাজ করেছে দীর্ঘদিন। চৈতন্য জাগিয়ে রাখা যে সম্প্রদায়ের কাজ পার্টির ক্যাডারে পরিণত হয়ে সেই সম্প্রদায়ও কয়েক বছরের মধ্যেই পরিণত হয়েছে দলদাসে। প্রায় প্রতিটি স্কুলেই এলাকার পার্টি পদাধিকারীদের কেউ একজন শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন এবং স্কুলের কর্মকান্ড তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। [পরিতোষের স্কুলের শিক্ষক বিপুল যেমন লোকাল কমিটির

সেক্রেটারি] শিক্ষার রাজনীতিকরণের সেই সূচনা। আত্ম-সমালোচনা, রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার কোনওকিছুই তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে আর পড়ে না। এমনকি বিদ্যায়তনে নিজের দায়িত্বটুকুও ঠিকভাবে আর পালন করতে উৎসাহী নয় বেশিরভাগ শিক্ষকই। ছাত্রদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তোলার বিষয়ে তাই তাদের মধ্যে বিতর্ক বাঁধে না কোনও। পেমিশন ছাড়া তাদের আর কোনও কিছুতেই উৎসাহ নেই। দেশি-বিদেশি অখ্যাত নেতার মৃত্যুতে ছাত্রদের দিয়ে দরখাস্ত লিখিয়ে ছুটি আদায়, তাড়াতাড়ি ফেরার ট্রেন ধরা, ডিমের দর, লাইফ ইন্সিওরেন্স - এইসব আলোচনাতেই তাদের কেটে যায়।^{১৪} মাধ্যমিকের মৌখিক পরীক্ষা নিতে গিয়ে সহকর্মীদের যে সব কর্মকাণ্ডের সাক্ষী পরিতোষ থেকেছে তাতে পরীক্ষা সর্বস্ব শিক্ষানীতির ভেঙে পড়া চেহারাই ফুটে বেরিয়েছে। শিক্ষকতার মাস-মাইনের উপরি পাওনা হিসাবে প্রাইভেট টিউশনির ব্যবসাও ফেঁদে বসেছেন অনেক শিক্ষক। প্রাইভেট টিউশনির এই রমরমা বস্তুত স্কুলের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ভিতর থেকে ধ্বংস করেছে। পরিতোষের সহকর্মী শিক্ষক অনায়াসেই তাই টিউশনে ছাত্র ধরার অনৈতিক পদ্ধতি বাতলে দেয় লজ্জাহীনভাবেই-

“ধুত, টিউশনি পাবার কায়দা জানো না? - হেডমাস্টারকে বলবে প্রমোশনের ব্যাপারে খুব কড়া হতে, আর ক্লাসে গিয়ে কিছু পড়াবে না। দেখবে ‘বাপ বাপ’ বলে ছেলে আসবে।”^{১৫}

দুর্নীতির এক সর্বগ্রাসী ছায়া পরিতোষ টের পেয়েছে সরকারী কাজকর্মে। দুর্নীতিমুক্ত সরকারের স্লোগান যেন ভেঙে পরেছে এই তিন-চার বছরেই। পরিতোষের বড় শ্যালকের রেশনের দোকান। তার সঙ্গে কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বাসুদেব দাশগুপ্ত গণবন্টন ব্যবস্থার আশিরনখর দুর্নীতির ক্ষুধার্ত মুখবাদান তুলে এনেছেন। দিনে দুপুরে পুকুর চুরির বড় বড় উদাহরণ তুলে ধরেছে বড় শ্যালক। এফসিআই এর ওয়াগন থেকে গোড়াউনে খাদ্যশস্য পৌছানোর সময় থেকে এই দুর্নীতির শুরু। ওয়াগন থেকে যে পরিমাণ খাদ্যশস্য খালাস হয় সেই পরিমাণ মাল গোড়াউনে পৌঁছায় না। তার আগেই বেশ কিছু পরিমাণ খাদ্যশস্য বেরিয়ে যায়। হিসাব ঠিক রাখার জন্য রেশন ডিলারদের ডেলিভারির সময় কিছু কিছু কম দেওয়া হয়। বছরের শেষে ভেরিফিকেশনের সময় যখন হিসাবে শর্ট পড়ে, তখন মেঝেতে বড় বড় কিছু গর্ত খুঁড়ে রিপোর্ট দেওয়া হল - ইঁদুরে খেয়ে গেছে। যদি হিসাবের গরমিল খুব বেশি হয়ে যায় অর্থাৎ অতো খাদ্যশস্য ইঁদুরকে খাওয়ানো বিশ্বাসযোগ্য না হয়, তাহলে একদিনের জন্য খোলা বাজার থেকে গোটা মালটা ভাড়ায় নিয়ে এসে হিসাব মিলিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া স্থানীয় স্তরে রেশন ডিলাররা ঘুষ দিয়ে শয়ে শয়ে ভুয়ো কার্ড বানিয়েছে। সেই কার্ডের প্রাপ্য পুরো শস্য খোলাবাজারে বিক্রি হয়ে যায়। [পরিতোষের শ্যালকের যেমন সাতশো ভুয়ো কার্ড রয়েছে]। এই লভ্যাংশ একা রেশন ডিলার ভোগ করেন না। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছেও তার শতাংশের হিসাব পৌঁছে যায়।

“আমার কি মনে হয়, জানো? সরকার চায় সকলে চুরি করুক। কারণ আমি চুরি করছি বলে সাব-ইন্সপেক্টর ফাঁপছে, সাব-ইন্সপেক্টর চুরি করছে বলে ইন্সপেক্টর ফুলছে, ইন্সপেক্টর চুরি করছে বলে কন্ট্রোলার জমি কিনছে, কন্ট্রোলার চুরি করছে বলে ডেপুটি-কন্ট্রোলার গাড়ি হাঁকাচ্ছে, এইভাবে ডেপুটি কন্ট্রোলার থেকে ফুড কমিশনার, ফুড কমিশনার থেকে ফুড মিনিস্টার ... তা থেকে ... বুঝতে পারছ? নইলে দেশ অচল।”^{১৬}

গণবন্টন ব্যবস্থায় দুর্নীতির আরও হাজার ফিকির খোলা রয়েছে। গুদামে থাকতে থাকতে চাল, গম পচে যায়। তখন সেই পচা চাল গম যৎসামান্য দামে পশুখাদ্য হিসাবে বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু যে কেনে, সে ওই যৎসামান্য দাম দিয়ে নেবার সময় নিয়ে যায় ভালো মালটা। আর সেই পচা চাল গম যা আসলে পশুখাদ্য তা রেশনে চলে আসে। তা বন্টন করা হয় জনগণের মধ্যে।

পরিতোষের সহকর্মী শান্তি স্থানীয় পঞ্চায়েতের সদস্য। সরকারী প্রকল্পের নিদারুণ বাস্তবায়ন তার সঙ্গে কথাবার্তায় উঠে আসে। ইউনিসেফের স্কুল তৈরির টাকায় এসেছে একশো বস্তা সিমেন্ট। বাকি মেটিরিয়ালস কবে আসবে তার পাত্তা নেই। তিনমাসও হতে পারে, ছয় মাসও হতে পারে। শান্তির কথায়, চুরি করার এটাই মোক্ষম সুযোগ। একশো বস্তা সিমেন্ট স্ট্রেফ ব্ল্যাকে ঝেড়ে দাও। তিন হাজার টাকার সরকারি সিমেন্ট খোলাবাজারে ছয় হাজার টাকায় বিক্রি হয়ে যাবে। সিমেন্টের হিসাব চাইলে বলে দিলেই হল যে সিমেন্ট জমে গিয়েছিল। পরিতোষ আশঙ্কা প্রকাশ করে, “জমে যাওয়া সিমেন্ট যদি দেখতে চায়?” শান্তির আত্মবিশ্বাসী উত্তর, -

‘চাইলেই হল? হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব না?’^{১৭}

শান্তির উজ্জ্বলতাই প্রকাশ, গণবন্টন ব্যবস্থার মতো এখানেও দুর্নীতি সর্বস্তরে। সুতরাং সেই দুর্নীতির শৃঙ্খলে টান দেওয়ার স্পর্ধা কেউ দেখাবে না। নিজে কাঁচের বাড়িতে থেকে অন্যের কাঁচে ঢিল ছোঁড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

[৬]

রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে বিচ্ছিন্নতাই খেলাধুলা উপন্যাসে পরিতোষের সবচাইতে গভীর সমস্যা। তার বামপন্থী আদর্শের সঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ও সংগঠনের কোনও মিল যত দিন যাচ্ছে সে আর খুঁজে পাচ্ছে না। এক নিরাশ্রয় বিচ্ছিন্নতাবোধ তাকে গ্রাস করছে ক্রমশ। সিপিআই, সিপিএম কিংবা সিপিএমএল - কোনও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকেই সে পূর্ণ সমর্থন জানাতে পারছে না এখন। সিপিআই পার্টির অন্ধ রাশিয়া প্রীতি, নকশালদের আত্ম-সমালোচনায় অনীহা, সিপিএম পার্টির ভোট-সর্বস্ব রাজনীতি সবকিছুর স্বরূপই তার কাছে ক্রম-উন্মোচিত হচ্ছে। প্রত্যেকটি পার্টিই মেতে আছে একে অপরকে আক্রমণে। স্থানীয় সিপিআই নেতা সন্তোষবাবু তাকে নকশাল ছেলেদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে দেখে করুণা করে পরিতোষকে ‘কী চায় পিকিং’ নামে বই পড়তে দেয়। সেখানে মাও-সে তুং সম্পর্কে ব্যক্তিগত কুৎসা ও আক্রমণ ছাড়া একটি যুক্তির কথাও খুঁজে পায় না পরিতোষ। মূর্তিভাঙার ব্যাপারে পরিতোষ একটি প্রবন্ধ লেখার পরিকল্পনা করলে নকশাল-পন্থী বাদল দু-একদিনের মধ্যেই তার আপত্তির কথা জানায়। পরিতোষ বুঝতে পারে নিজেদের মূল্যায়নে নকশালদের অনীহার বিষয়টি। গণ-সংগঠনের ব্যানারে পরিতোষ গান করে। সেই গতে বাঁধা গান! দুশ বিঘে জমির মালিক যদু তালুকদার। সে তার ক্ষমতার নোংরা হাত বাড়িয়েছে চাষি চরণদাসের বৌ মধুমালার দিকে। মাস তিনেক ওই নৃত্যনাট্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরবার পর পরিতোষের নিজের মনেই নানা প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। যে-সব জায়গায় এই নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হচ্ছে সেখানে দুশো বিঘে জমির মালিক তো দূরের কথা পঞ্চাশ বিঘাও কজনের আছে গুণে বলা যায়। আগেকার সেই জোতদারি শোষণ এখানে আছে কি না সেই বিষয়েই সন্দেহ জাগে তার। পরিবর্তে চাষের খরচ বৃদ্ধি, ফসলের নায্য মূল্যের অভাব - ইত্যাদি বিষয়ে সে চাষীদের ক্ষোভের আঁচ টের পায়। নেতৃত্বকে নিজের অনুভূতির কথা বলে সমর্থন তো সে পায়ই না উলটে জোটে ব্যঙ্গ। চিরাচরিত ছকে বাঁধা নীতির বাইরে এসে সময়পোযোগী ইস্যু তুলে আনলে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। সিপিএম পার্টি তাই কানেই তোলে না সেসব। ‘আজ জীবন খুঁজে পাবি ছুটে ছুটে আয়’ ইত্যাদি ‘সব পেয়ে গেছি’ ধরনের গান তখন পার্টি প্রমোট করছে। সুতরাং সাংস্কৃতিক কর্মী পরিতোষ অনুভব করে নিজের কাজের অর্থহীনতা। কমলের মতো পরিচিত সিপিএম কর্মী নকশাল আন্দোলনকে সিআইএ এর চক্রান্ত বলে দেগে দিয়ে নাটক লেখে কলেজের পত্রিকায়। সেই নাটকে চারু মজুমদারকে [নাটকে নাম পাল্টে তাঁকে উল্লেখ করা হয়েছে ‘হারু’] ঘৃণ্য দালাল রূপে তুলে ধরা হয়েছে, যে আসলে নিজের স্বার্থের জন্য কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যা করিয়েছে। এই ভাবে নকশালবাড়ি আন্দোলনের ইতিহাস পালটে দেওয়ার রাজনৈতিক চক্রান্ত টের পেয়েছে পরিতোষ। শ্রেণি সংগ্রাম মূলক নতুন যুগের নাটক অভিনয়ের পরিবর্তে তাই স্কুলে কলেজে পাড়ার জলসায় অভিনীত হতে থাকে শ্যামা আর শাপমোচন। কমল যখন হারমোনিয়াম বাজিয়ে ভাবে বিহ্বল হয়ে গাইতে থাকে ‘ক্ষমিতে পারিলাম না যে/ ক্ষম হে মম দীনতা’, বলে -

“গানটা যখন গাই, অনেকেই তখন চোখের জল রাখতে পারে না।”^{১৮}

তখন ধৈর্যচ্যুত পরিতোষ গানের ফাঁকে ফাঁকে পত্রিকার হেডিং পাঠ করে তাকে শোনায়, ‘সিআরপি-র অত্যাচারে বুটে পিষ্ট হয়ে সাত দিনের শিশু খুন, প্রধান শিক্ষককে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগে কংগ্রেসের যুববাহিনীর সাতজন গ্রেফতার, হাজারিবাগ জেলে গুলিতে আটজন নিহত ইত্যাদি। ব্যঙ্গের ছলে পরিতোষ বলে ওঠে, -

“চোখে জল না-আসার ব্যবস্থা করছি।”^{১৯}

১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে পরিতোষের উদ্যোগে এবং সম্পাদনায় বের হয় একটি পত্রিকা ‘সময়ের কাছে’। ‘লরেন্স আর উইশার্ট প্রকাশিত কার্ল মার্কসের বই পড়ে কমিউনিস্ট’ শরদিন্দুবাবু এবং এলাকায় নকশাল বলে পরিচিত একদল ছেলের সহযোগিতায় প্রকাশিত হয় ‘সময়ের কাছে’। রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার চেষ্টাই ছিল পরিতোষের লক্ষ্য। যে ব্যবস্থা, যে সিস্টেম চালু আছে তার মূল্যায়ন। কেবল দলকে গালাগাল করা নয়, মানুষকে বোঝানো দরকার এই ব্যবস্থা বজায় থাকলে সিপিএম-কেও স্নেহতন্ত্রী হতে হবে। নকশাল ছেলেদের সঙ্গে মিলে কাগজ বার করলে সিপিএমের গৌঁসা

হতে পারে এই আশঙ্কা নিয়েই ‘সময়ের কাছে’ প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যায় কানপুর গণহত্যা, মূল্যবৃদ্ধির প্রকৃত কারণ বিশ্লেষণ করে আলোচনা, এলাকার বিড়ি শ্রমিকদের ধর্মঘটের উপর একটি বিস্তৃত রিপোর্ট ইত্যাদি থাকলেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল পত্রিকার টাইটেলের উপর জীবনানন্দের কবিতার একটি উদ্ধৃতি। সিপিএমএল এর যুবকদের মধ্যে বিক্ষোভ তৈরি হয় একজন প্রতিক্রিয়াশীল কবির উদ্ধৃতি দেওয়া কি ঠিক হল? দ্বিতীয় সংখ্যায় আমেরিকা ও রাশিয়া দুটি দেশই কিভাবে ভারতকে শোষণ করেছে সে বিষয়ে সলিলের একটি প্রবন্ধ প্রকাশের পর এলাকার সিপিআই কর্মীদের মুখগুলি খমখমে হয়ে উঠেছে বুঝতে পারে পরিতোষ। পরের সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর সিপিএম এর কর্মীরাও ক্ষেপে যায় পরিতোষের উপর। ট্রেড-ইউনিয়নের সংশোধনবাদী নেতৃত্ব নীরব থাকছে শ্রমিক শ্রেণির মৌলিক অধিকারে, প্রতারণা করছে বৃহত্তর শ্রমিক স্বার্থকে, শ্রমিককে লেলিয়ে দিচ্ছে শ্রমিকের বিরুদ্ধে, সীমাবদ্ধ রাখছে নিজেদের ট্রেড ইউনিয়নের নির্বাচনের মধ্যে – ইত্যাদি বক্তব্য প্রকাশের পর লোকাল কমিটির সেক্রেটারি, পরিতোষের সহকর্মী বিপুল প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলে ওঠে, -

“মনে রাখবেন বামফ্রন্টের আমলেই আপনি এই পত্রিকাটি বার করতে পারছেন। ৭৫ বা ৭৬ সালে ভাবতে পারতেন?”^{২০}

বস্তুত এই একটি পত্রিকার সূত্রে সব রাজনৈতিক দলের অসহিষ্ণুতার ভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কেউই নিজের বিরুদ্ধে একটি কথাও শুনতে প্রস্তুত নয়। ‘আমিই শ্রেষ্ঠ’ - বর্বর রাক্ষসের এই আফালনই যেন সর্বত্র ধ্বনিত হচ্ছে। সিপিএম এর নেতা বিপুলের সঙ্গে মিলে একটি পত্রিকা প্রকাশেরও উদ্যোগ নেয় পরিতোষ। বিপুল প্রাথমিকভাবে উৎসাহও দেখায়। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর একটু স্থির হয়ে নিয়ে এই বিষয়ে ভাবা যাবে বলে সে জানায়। কিন্তু পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর স্কুলের নির্বাচনের ব্যস্ততা। সেইসব পার হয়ে অবশেষে নির্ধারিত দিনে আলোচনার জন্য পার্টি অফিসে গিয়ে পরিতোষ দেখে বিপুল নেই। অনন্ত বসে আছে একা। আসন্ন মিউনিসিপালিটি ইলেকশন নিয়ে কথাবার্তা হতে থাকে তাদের। বিপুল এসে পৌঁছায় না। পরিতোষ বুঝতে পারে ইলেকশনের পর ইলেকশন পার হয়ে যাবে। কিন্তু জনগণের রাজনৈতিক মান উন্নয়নের কোনও চেষ্টা শাসকদল দেখাবে না। সে বোঝে নির্বাচনের মাধ্যমে যেনতেন প্রকারে ক্ষমতায় থাকাই এই মার্কসবাদী দলের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে উঠেছে। জন-বিপ্লবের থেকে ঢের দূরে সেই অবস্থান। এর মাস তিনেক পরেই এক দুপুরবেলা বালিকা বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের সম্মেলনে গাইতে গিয়ে পরিতোষ মাইকে ঘোষণা শুনতে পায় -

“কমরেডস মাংস সিদ্ধ হতে দেবি আছে। আর-একটু তাস চালিয়ে যান।”^{২১}

বলাই বাহুল্য রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট একটি রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করার থাকে না পরিতোষের। সম্মেলন, গণ-ডেপুটেশন, হরতাল, ছকে বাঁধা সাংস্কৃতিক চর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লব বিপ্লব খেলার এই ঘৃণ্য হিপোক্রাসি, জনগণকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ফেলে রেখে ক্ষমতাভোগের এই নির্লজ্জতা পরিতোষকে বিপ্লবতার দিকে ঠেলে দেয়। মাও সে তুং বলেছিলেন, -

“বিপ্লব একটি সূচিকর্ম নয়, বিপ্লব একটি ভোজসভা নয় - বিপ্লব রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। আজকের পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিউস্ট নেতাদের সে যেন একই সুরে মনে করিয়ে দিতে চায়, ‘বিপ্লব সম্মেলন নয়, বিপ্লব গণ-ডেপুটেশন নয়, বিপ্লব ‘বাংলা বন্ধ’ নয় - বিপ্লব রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম।”^{২২}

আর রাজনৈতিক অশিক্ষার এই পরিকল্পিত চর্চার কারণেই কমিউনিস্ট শাসিত রাজ্যে বালক ব্রহ্মচারীর মতো ধর্মীয় নেতার উদয় ঘটে। পরিতোষ দেখতে পায় বাবার বাণীতে ছেয়ে যাচ্ছে চারদিক। যে বাণীর মধ্যে আবার স্কুলশিক্ষক বিমলবাবু ‘বেশ একটা নকশাল-নকশাল গন্ধ’ খুঁজে পান। রাজনৈতিক অশিক্ষার কারণেই যে বালক ব্রহ্মচারীর বেদ-নির্ভর বস্তুবাদের^{২৩} সঙ্গে কমিউনিস্ট আদর্শের মিল বিমলবাবুর মতো অনেকেই খুঁজে পাচ্ছেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না পরিতোষের। সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ যাদের পয়লা নম্বর শত্রু সাময়িক একটা কৌশল হিসাবে বাবার সঙ্গে হাত মেলাতে তাদের অসুবিধা নেই বলেই মনে করেন বিমলবাবুর মতো ভুল-শিক্ষিত মানুষেরা। পরিতোষকে তাই বিমলবাবুকে মনে করিয়ে দিতে হয় বাবার বাণীর সঙ্গে নকশাল রাজনীতির মূলগত তফাতের জায়গাটিকে।

“আমাদের দেশের বন্যা, খরা, এসবের কারণ হিশেবে বালক ব্রহ্মচারী দেখলেন মানুষের পুঞ্জীভূত পাপ। আর নকশালরা সেখানে এর কারণ হিশেবে দেখাবে আমাদের দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো, শাসকশ্রেণীর চরিত্র, বিদেশি শোষণ...এই সব।”^{২৪}

চারপাশের এই এতো কিছু পচন লক্ষণের মধ্যে দাঁড়িয়ে পরিতোষ বুঝতে পারে গণসঙ্গীত, কাগজ প্রকাশ, স্টাডি সেন্টার তৈরি ইত্যাদির মতো বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কোনও কাজেই দেবে না। মানুষের অন্তর্নিহিত আগুন ক্রমশ নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। নিউক্লিয়ার শীতের গোদুলী ঢেকে দিচ্ছে চারপাশ। জ্বালানি কাঠের বড় অভাব আজকের এই সমাজ-বাস্তবতায়। তাই অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্নতাই যেন পরিতোষের নিয়তি হয়ে ওঠে। পরবর্তী তিরিশ বছরে আমরা পরিতোষের সেই আশঙ্কাকেই বাস্তবে রূপ পেতে দেখি। দীর্ঘদিন খেলার দর্শক সেজে থাকা সাধারণ মানুষ কোনওদিনই খেলোয়াড় হয়ে মাঠে নেমে পড়ে না। দুই দশকের সবুজ বিপ্লবের পরেও নিরন্ন মানুষের সংখ্যা বিশেষ কমে না। রাজ্য ও দেশে বেকারত্বের সীমা সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছেছে, দেশে এই মুহূর্তে প্রতি চারজন মানুষের একজন নিরক্ষর, এদেশে এখনও সতীদাহ হয়, সাপে কাটা মৃতদেহকে ভেলায় ভাসানো হয়, বালক ব্রহ্মচারীর মৃতদেহ পঞ্চাশ দিন বরফে রেখে দেওয়া হয় ধ্যান ভেঙে তিনি ফিরে আসবেন বলে, কৃষকের উপর এখনও গুলি চলে স্থানে স্থানে, ক্ষুদ্র চাষি জমি হারিয়ে ক্ষেত মজুরে পরিণত হচ্ছেন, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উপর শোষণের মাত্রা ক্রমবর্ধমান, মোড়ে মোড়ে প্রতিমুহূর্তে দেবতার জন্ম হয়, ধর্মে ধর্মে দাঙ্গা বাঁধে, ‘বছরে তিরিশবার চিত্রাঙ্গদা আর শ্যামা-শাপমোচনের অশ্রুমোচনের’ মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে সাংস্কৃতিক কার্যকলাপ। ‘খেলাধুলা’ তাই কোনও শেষ হয়ে যাওয়া উপন্যাস নয়। লিখিত হওয়ার ৪০ বছর পরেও দৈর্ঘ্য-প্রস্থে স্ফীত হচ্ছে এই লেখা। চারপাশের যাপনকে নিজের ক্ষুধার্ত গহ্বরে টেনে নিচ্ছে সে। অনেকটা ব্ল্যাকহোলের মতো।

Reference:

১. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, ‘রচনা সংগ্রহ’, কলকাতা, আলাপ প্রকাশন, জানুয়ারি, ২০১৪
২. উইলিয়াম বারোজ আমেরিকান বিট জেনারেশন আন্দোলনের অন্যতম লেখক, তাঁর বিখ্যাত রচনা ‘নেকেড লাঞ্চ’ (১৯৫৯), বাংলায় হাংরিদের সঙ্গে বিট আন্দোলনের কবি-লেখকদের তুলনা টানা হয়ে থাকে, বাসুদেব দাশগুপ্তের রচনা শৈলীতে বারোজের প্রভাব নির্ণয় তেমনই এক অস্পষ্ট প্রচেষ্টা।
৩. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, সাক্ষাৎকার : ‘স্বপ্নেও আমার যজ্ঞক্রিয়া চলতে থাকে’, দ্র. ‘রচনা সংগ্রহ’ : বাসুদেব দাশগুপ্ত, কলকাতা, আলাপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩০৪
৪. তদেব, পৃ. ৩০৫
৫. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, সাক্ষাৎকার : ‘আমার ক্ষুধা ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তির ক্ষুধা’, দ্র. ‘রচনা সংগ্রহ’ : বাসুদেব দাশগুপ্ত, কলকাতা, আলাপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩২০
৬. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, ‘খেলাধুলা’, হাওড়া, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৯
৭. ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে চারু মজুমদার এই আটটি ঐতিহাসিক দলিল রচনা করেন, কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী শাখার ভাবধারা তৈরিতে এই আটটি রচনার ভূমিকা অনস্বীকার্য, সূত্র : <http://cpiml.org/category/library/charu-mazumdar-collected-writings/eight-documents-1965-1967/>
৮. ঘোষ, নির্মল, ‘নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য’, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮১, পৃ. ৪
৯. ভট্টাচার্য, নবাবু, ‘হারবার্ট’, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৪-৩৫
১০. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, সাক্ষাৎকার : ‘স্বপ্নেও আমার যজ্ঞক্রিয়া চলতে থাকে’, দ্র. ‘রচনা সংগ্রহ’ : বাসুদেব দাশগুপ্ত, কলকাতা, আলাপ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ. ৩০৬

১১. এর আগে ১৯৭৫ সালে বাসুদেব দাশগুপ্তের 'বাবা' গল্পের চরিত্র হিসাবে আমরা পেয়েছি স্কুলশিক্ষক পরিতোষ, তার স্ত্রী পদ্ম ও ছেলে পাবলোকে। ১৯৮১ সালে লেখা এই উপন্যাসেও পরিতোষের এই পরিচয় ও পরিবার বহাল রয়েছে। এরপর মৃত্যুগুহা থেকে প্রথম কিস্তি (১৯৮৬) মৃত্যুগুহা থেকে দ্বিতীয় কিস্তি (১৯৮৭) মৃত্যুগুহা থেকে তৃতীয় কিস্তি (১৯৮৭) -এই তিনটি ছোটগল্পেও এই একই পরিতোষ ও তার পরিবারের কথা উঠে এসেছে।
১২. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, 'খেলাধূলা', হাওড়া, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১২
১৩. ঐ
১৪. বাসুদেব দাশগুপ্তের 'মৃত্যুগুহা থেকে তৃতীয় কিস্তি' গল্পটিতেও স্কুলের টিচার্স রুমে শিক্ষকদের পারস্পরিক কথাবার্তার এমনই এক অবক্ষয়িত আমোদগেঁড়ে রূপ উঠে এসেছে।
১৫. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, 'খেলাধূলা', হাওড়া, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ৩০
১৬. তদেব, পৃ. ৪৫-৪৬
১৭. তদেব, পৃ. ২৬
১৮. তদেব, পৃ. ৫৩
১৯. তদেব, পৃ. ৫৪
২০. তদেব, পৃ. ৭৪
২১. তদেব, পৃ. ৮৮
২২. তদেব, পৃ. ৫৭
২৩. কমিউনিস্ট আদর্শ ও বেদ বিষয়ে বালক ব্রহ্মচারীর বক্তব্য বিশদে জানার জন্য আগ্রহীরা এই বইটি পড়তে পারেন : ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী। 'ভারতীয় বেদভিত্তিক সাম্যবাদ' (প্রথম খন্ড)। কলকাতা, সন্তান দল। ১৩৩৭ [?]
২৪. দাশগুপ্ত, বাসুদেব, 'খেলাধূলা', হাওড়া, মনফকিরা, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ১৭